বাংলা ছোটগল্প
বিচিত্র ভাবনা

সন্দীপ বর
রাকেশ জানা

বাংলা ছোটগল্প
বিচিত্র ভাবনা

সন্দীপ বর ॥ রাকেশ জানা

একুশশতক
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

BANGLA CHHOTO GALPO
BICHITRA BHABNA
by Sandip Bar & Rakesh Jana

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৪

© সন্দীপ বর

প্রকাশক
সুমিত্রা কুণ্ডু
একুশ শতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ
মনীষ দেব

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
৫১এ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য : ৩০০ টাকা

উৎসর্গ

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এবং শিক্ষাগুরু
অধ্যাপক ড. শ্রাবণী পাল
ও
অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন মিদ্দে মহাশয়কে

সূচিপত্র

আত্মবলিদানে খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন
দীপঙ্কর ধাড়া ২৩

রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের মৃণাল প্রতিবাদের জীবন্ত প্রতীক
ড. সন্দীপ বর ৩১

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমারাণী' : সামগ্রিক ভাবনা
স্বপন হাজরা ৩৫

ভালোবাসার কাছে যুক্তি প্রযোজ্য নয়: প্রসঙ্গ কচি-সংসদ
ড. তুষার নস্কর ৪১

তারিণী মাঝির আদিম জীবনতৃষ্ণা
ড. বৃন্দাবন মণ্ডল ৪৬

আখ্যান এবং আঙ্গিকের বিস্ময় নিয়ে বনফুলের 'বুধ্‌নী'
ড. মনুয়া পাঁজা ৫১

সোমেন চন্দের দাঙ্গা: রক্তাক্ত সময়ের আখ্যান
মানিকলাল সাহা ৫৮

প্রেমেন্দ্র মিত্রের তেলেনাপোতা আবিষ্কারের কাব্যময়তা
ও রোমান্টিকতার ছোঁয়া
সত্যব্রত পাত্র ৬৬

আদাব : সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সম্প্রীতির দলিল
অভি কোলে ৭১

সাদা ঘোড়া : একটি দাঙ্গাবিরোধী গল্প
ড. কিঙ্কর মণ্ডল ৭৮

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটবকুলপুরের যাত্রী : শোষক-শোষিতের
দ্বান্দ্বিক উপাখ্যান—বিরোধভাবের রূপায়ণ
অনুপকুমার দাশ ৮৪

বিমল করের জননী : এক শাশ্বত সত্যে উড়ান
অয়ন ভারতী ৮৯

অশ্বমেধের ঘোড়া গল্পে মনোস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন
ড. জুবিলি দাস ৯৮
শজারুর কাঁটা : সম্পর্কের জটিল জালের রহস্যভেদ
বুবাই পিরি ১০৩
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পলাতক ও অনুসরণকারী' :
একটি সময়ের দলিল
ড. সঞ্জীব মান্না ১১৬
নগ্ন নারী : শক্তির আধার, প্রসঙ্গ 'দ্রৌপদী'
ড. রাকেশ জানা ১২৩
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'প্লাবনকাল' : বিশ্লেষণী পাঠ
ড. শশী অগ্রওয়াল ১৩৮
অভিজিৎ সেনের 'চোখে ঘুম নেই' : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
সুতনু দাস ১৪৩

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমারাণী' : সামগ্রিক ভাবনা

স্বপন হাজরা

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে হারিয়ে যাওয়া পল্লীবাংলার রূপ-রস-গন্ধের সমাহার নিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৪ খ্রি:—১৯৫০ খ্রি:) বাংলা সাহিত্যে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। বস্তুত, তাঁর হাত ধরেই পল্লীপ্রকৃতির আনাচে-কানাচে পাঠকমহলের নিত্যযাতায়াত শুরু হয়। ফলে অচিরেই তিনি হয়ে উঠেছেন বাঙালির অন্তঃপুরের একজন। সমালোচক শ্রী প্রমথনাথ বিশীর মতে—

'বাংলাদেশে বিভূতিভূষণের চেয়ে শক্তিমান লেখকের অভাব নাই, কিন্তু একমাত্র শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে এমন জনপ্রিয় ও তৃপ্তিদায়ক লেখক আর আছেন কিনা সন্দেহ। ইহার কারণ, তাঁহার অপু (তাঁহার সৃষ্ট সব চরিত্রই অল্পবিস্তর অপুর রূপান্তর), আমাদেরই বিস্মৃত শৈশব। তাঁহার নিশ্চিন্দিপুর আমাদেরই ছাড়িয়া-আসা গ্রাম, তাঁহার রচনা সেই গ্রামেরই মানস যাত্রার পথ; আর স্বয়ং বিভূতিভূষণ, তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে ভুলিয়া যাই যে তিনি একজন লেখক, মনে হয় তিনি যেন আমাদের শৈশবের বিস্মৃত প্রায় খেলার সাথী, মনে হয় তিনি যেন আমাদের পূর্বজন্মের বিস্মৃত খেলার সঙ্গী। তাই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র, তাঁহার অঙ্কিত পল্লীপ্রকৃতি, তাঁহার রচনা, এবং স্বয়ং লেখক-মানুষটি আমাদের এমন মুগ্ধ করে, তৃপ্তি দান করে, আমাদের বিস্মৃত শৈশবকে জাগাইয়া দিয়া পুনরায় সেদিনকার খেলাঘরে এমন অনায়াস আন্তরিকতার সহিত আহ্বান করে। আমার মনে হয়, এখানেই তাঁহার জনপ্রিয়তার রহস্যের মূলে। এমন কথা কয়জন সাহিত্যিক সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়? সাহিত্য সভায় তিনি যোগ্য আসন পাইবেন কিনা জানিনা, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, এই সর্দার-খেলুড়ির গলায় বনফুলের মালা পরাইয়া দিতে অন্য খেলুড়িগণ দ্বিধামাত্র করিবেনা।'[১]

স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে বিভূতিভূষণের কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯১৯ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি হুগলীর জাঙ্গিপাড়ায় মাইনর স্কুলে প্রথম শিক্ষকতার চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯২০ সালে উক্ত স্কুলে ইস্তফা দিয়ে সোনারপুর হরিনাভি স্কুলে সহশিক্ষক রূপে চাকরিতে যোগদান করেন। হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতার সময় যতীন্দ্রমোহন রায় নামে এক শিশু কবির অনুরোধে ১৩২৮ সনে 'প্রবাসী' মাঘ সংখ্যায় 'উপেক্ষিতা'

নামক ছোটগল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্য জীবন শুরু হয়। এর পরে ১৩২৯ সনে 'প্রবাসী' শ্রাবণ সংখ্যায় তাঁর দ্বিতীয় ছোটগল্প 'উমারাণী' প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি হরিনাভি স্কুলে ইস্তফা দিয়ে কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষণী সভার প্রচারকের চাকরিতে যোগদান করে পূর্ববঙ্গ সহ আসাম, ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁর প্রথমদিকের রচনাগুলোতে মৃত্যুজনিত বেদনার প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। ব্যক্তিগত জীবনে কয়েক বছরের ব্যবধানে পিতা মহানন্দ বন্দোপাধ্যায়, মাতা মৃণালিনী দেবী এবং প্রথমা স্ত্রী গৌরী দেবীর চিরতরে চলে যাওয়া থেকেই হয়তো ব্যক্তি বিভূতিভূষণের চেতন মনের মৃত্যুজনিত বেদনা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের অবচেতন মনে সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর প্রথমদিকের গল্পগুলোকে পারিবারিক গল্পের শ্রেণিভুক্ত করে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন—

'পারিবারিক জীবন লইয়া যে কয়েকটি গল্প রচিত হইয়াছে—'উমারাণী', 'উপেক্ষিতা', 'মৌরীফুল'—তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ করুণ রস ও যৌন প্রেমের একান্ত বর্জন বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। ইহাদের মধ্যে পরিকল্পনার মৌলিকতা নাই, কিন্তু ভাবের ঐকান্তিকতা ও করুণ রসের গভীরতা ইহাদের প্রধান গুণ।'[২]

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মেঘমল্লার' (শ্রাবণ১৩৩৮) এর অন্তর্ভুক্ত 'উমারাণী' গল্পটি দাদা-বোনের মধ্যেকার অপত্য স্নেহের সম্পর্কের করুণ পরিণতির গল্প। সংসার সমুদ্রে স্বামীর ঔদাসিন্যর ভারে অতলে তলিয়ে যাওয়া স্নেহশীলা উমারাণীর আখ্যান গল্পকথক সতীশের জবানীতে লেখক পাঠক মহলের কাছে উপস্থাপন করেছেন। গল্পকথক সতীশের ছোট বোন শৈলের সঙ্গে সুরেনের বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে শৈল মারা যায়। ছোট থেকেই অন্যান্য বোনের তুলনায় শৈলর সঙ্গেই সতীশের স্নেহের সম্পর্ক ছিল সবচেয়ে বেশি। গৌহাটির চা-বাগানের ঘরে বসে 'আকাশের মাঝখানকার জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষি মণ্ডলের মত' দূরে হয়ে যাওয়া শৈলর সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে দেখা যায় সতীশকে—

'কলকাতা থেকে ছুটি পেয়ে যখন বাড়ী যেতুম, শৈল বেচারী আমায় তৃপ্তি দেবার পন্থা খুঁজে ব্যাকুল হয়ে পড়ত। কোথায় কুল, কোথায় কাঁচা তেঁতুল, কার গাছে কথবেল পেকেছে, আমি বাড়ী আসবার আগেই শৈল এসব ঠিক করে রাখত, নানারকম মশলা তৈরী করে কাগজে কাগজে মুড়ে রেখে দিত, আমি বাড়ী গেলেই তার আনন্দ জড়ানো ব্যস্ততা ও ছুটোছুটির আর অন্ত থাকত না। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি বাড়ী গেলেই আমায় বেলের শরবৎ খাওয়াবার জন্যে পরের গাছে

বেল চুরি করতে গিয়ে ঘরের পরের কত অপমান সে সহ্য করেছে। আমারই জুতো বুনে দেবে বলে তার উল বুনতে শেখা। সেই শৈল তো আজকের নয়, যতদূর দৃষ্টি যায় পিছন ফিরে চেয়ে দেখলুম কত ঘটনার সঙ্গে, কত তুচ্ছ সুখ-দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে কত খেলাধূলায় শৈল জড়ানো রয়েছে।'[৩]

শৈলর প্রতি সুরেনের ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। শৈলর মৃত্যুর পর সুরেন পুনরায় বিবাহ করতে রাজী হয়নি। তারপর আত্মীয়—স্বজনের অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই বছর তিনেক পর সে উমারাণীকে বিয়ে করে। উমারাণীকে বিয়ে করলেও সুরেন কখনোই তাকে শৈলর জায়গা দেয়নি। সময়ের সাথে সাথে উমারাণীর প্রতি তার ঔদাসীন্য মনোভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এ নিয়ে উমারাণী কারোর কাছে কোনো অনুযোগ করেনি। নীরবে প্রতিক্ষা করে গিয়েছে আমৃত্যু। সযত্নে আঁকড়ে রেখেছে সুরেনের পুরোনো চিঠিগুলোকে। যা দেখে সতীশের মনে হয়—

'কৃপণের ধনের মত উমারাণী যার পুরানো চিঠিগুলো এমন সযত্নে রক্ষা করছে, তার মধুর হৃদয়ের স্নেহচ্ছায়া—গহন যূথীবনে যার স্মৃতির নীরব আরতি এমনি দিনের পর দিন প্রতি সকাল সাঁঝে চলছে, কেমন সে হতভাগা দেবতা, যে এ উপাসনা মন্দিরের ধূপ-গন্ধকে এড়িয়ে চিরদিন বাইরে বাইরেই ফিরতে লাগল।'[৪]

তবে শুধু সুরেনের ঔদাসীন্যতাই নয়; উমারাণীর মনের ক্ষত ছিল আরও অনেক গভীর। বছর চৌদ্দ-পনের'র উমারাণী ছিল মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত। বিয়ের আগেই তার মা মারা যায়। বিয়ের অনেক দিন পর প্রথমবার তার পিতা তাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিজের কাছে কিছুদিনের জন্য নিয়ে যাবে বলেছিল, কিন্তু চাকরি থেকে ছুটি না পাওয়ায় কলকাতায় এসে তাকে নিয়ে যেতে পারেনি। মাসখানেক পর কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। বিয়ের কনে হয়ে বাপের বাড়ি থেকে একেবারে অচেনা জায়গায়, অচেনা সংসারে চৌদ্দ-পনের বছরের উমারাণী সেই যে এসেছিল, আর কখনো ফিরে যেতে পারেনি নিজের শৈশবের স্মৃতিমাখা পশ্চিমে।

উমারাণী ছিল তার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। যদিও তার পরে এক বোন হয়েছিল, যে আঁতুড়েই মারা যায়। স্নেহশীলা দিদির যে রূপ তার মধ্যে এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল তা নতুন সংসারে এসে প্রস্ফুটিত হয়। শৈলর ছোট ভাই শচীশকে সে 'কোমল স্নেহের সঙ্গে' 'স্নেহময়ী বড়দিদির মত' খাইয়ে দেয়। উমারাণীর এই রূপ সতীশের মনকেও সিক্ত করে তোলে। আসলে নিজের বোনের স্থানে উমারাণীকে মেনে নেওয়ার কথা হয়তো সতীশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু উমারাণী নিজ গুণে সতীশের হৃদয়ে সেই স্থানটি করে নিয়েছে। উমারাণী তার কাছে 'খুকী' থেকে

স্নেহের ছোট বোন 'রাণী' হয়ে ওঠে। শৈল সতীশের পশমের জুতো বুনে দেওয়ার জন্য উল বুনতে শিখেও প্রথমে নিজের স্বামীর জন্য গলাবন্ধ বুনেছিল। শৈলের মৃত্যুর পর সুরেনের কাছে একথা শুনে উমারাণী সতীশের জন্য পশমের জুতো বানায়। শুধু তাই নয়, বিদেশ বিভুঁই এ ঘুরে বেড়ানো সতীশকে বিয়ে দিয়ে উমারাণী এক জায়গায় থিতু করতে চায়। এজন্য সে অনেক আকাশ কুসুম পরিকল্পনাও করে। নিজের খাওয়ারের থেকে পয়সা বাঁচিয়ে দাদার বিয়ের পর নতুন বউকে দেওয়ার জন্য সে রূপোর কাঁটা তৈরী করে।

কেবল শৈলর শূন্যস্থান পূরণ করাই নয়, উমারাণী শৈলর অসম্পূর্ণ কর্তব্য-গুলোকেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছে। স্নেহশীলা বড়দিদির মতো সে যেমন শচীশকে যত্ন করেছে; তেমনি ছোট বোনের মতো সতীশের কাছে আবদার করেছে, অভিমান করেছে। আবার স্বামীর বঞ্চনা সত্ত্বেও সে প্রতীক্ষা করে গেছে। শেষপর্যন্ত স্বামীর দেওয়া পুরোনো চিঠিগুলো আঁচলে বেঁধে সে অপার্থিব জগতের পথে যাত্রা করেছে।

'উমারাণী' গল্পটি গল্পকথক সতীশের প্রতি উমারাণীর অকৃত্রিম ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। সতীশ উমারাণীর নিজের দাদা না হলেও সংসারে সেই ছিল একমাত্র উমারাণীর ভরসার জায়গা। চিরকাল ভবঘুরে জীবন কাটানো সতীশের সঙ্গে দেখা করবার জন্য উমরাণী সর্বদা উদ্গ্রিব থাকে। অন্যদিকে নানা কাজের ব্যস্ততায় উমারাণীকে সময় দিতে না পারলেও কলকাতায় এলেই সতীশ উমারাণীর খোঁজখবর নিত। টুনির মুখে সে শুনেছে উমারাণী আর কলকাতায় থাকে না। সে এক বৃদ্ধা পিসীমার সঙ্গে চাঁপাপুকুরের বাড়ীতে থাকে। সুরেন কালেভদ্রে সেখানে যায়। পাহাড়ের নির্জনে Gauss–Zollner–Helmholtz–Grekie–Logan–Dawson এঁর মতো জ্ঞানবীরদের আলোকচ্ছটায় দৃপ্তমান সতীশ কলকাতার সেনেট হলে আয়োজিত বৈজ্ঞানিকদের সভার মধ্যে থেকেও কল্পনা করে তার 'অভাগিনী স্নেহবঞ্চিতা বোনটির' কথা। তখন উমারাণীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য সতীশের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে—

'এতদিন নানা কাজের ভিড়ে আমার যে বোনটিকে আমি হারিয়ে বসেছিলুম, তারই কাছে স্নেহের বাণী বয়ে নিয়ে যেতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল।'[৫]

কলকাতা ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়ল তার আদরের 'রাণী' র কাছে যাবে বলে। দীর্ঘ আট বছর পর দাদা-বোনের দেখা হবে। এতদিন পর উমারাণীকে দেখে মনের অবস্থা কেমন হবে তার একটা আগাম কল্পনা করে সতীশ—

'আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমায় দেখে যে সে আনন্দ পাবে, সে আনন্দের পরিমাণ আমি একটু একটু বুঝছি, আমার বুকের তারে তার প্রতিধ্বনি

গিয়ে বাজছে। আজ এখনি তার স্নেহমধুর ক্ষুদ্র হৃদয়টির সংস্পর্শে আসব, তার কালো চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে আদর করতে পারব, তার মিষ্টি দাদা ডাকটি শুনব, এ কথা ভেবে আনন্দে আমার মনের পাত্র ছাপিয়ে পড়েছিল।'[৬]

'পল্লী-লক্ষীদের সাঁজের শাঁখের রব নিস্তব্ধ বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছিল'—এমনই এক মুহূর্তে উমারাণীর সঙ্গে সতীশের দেখা হল। তবে আট বছর আগের উমারাণীর সঙ্গে এই উমারাণীর বাহ্যিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলে মাথা ভর্তি উমারাণীর এখন আর চুলের যত্ন করে না। চুলগুলোর রং কটা হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, উমারাণী আগের থেকে অনেক রোগাও হয়ে গেছে। 'আট বছর আগেকার সেই স্বাস্থ্যশ্রীসম্পন্না মেয়েটির সঙ্গে বর্তমানের এই নিতান্ত রোগা মেয়েটির তুলনা করে' সতীশের মন কেঁদে উঠল। সে তার ডাক্তারি চোখ দিয়ে ধরতে পেরেছে উমারাণীর থাইসিস হয়েছে। তার মৃত্যু আসন্ন। মৃত্যুর আগে উমারাণী সতীশকে বিয়ে করে সংসারী হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে, সতীশের জন্য পশমের জুতো তৈরী করেছে। টুনির কাছে ভবঘুরে জীবন কাটানো সতীশের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে। অপরদিকে আমরা দেখি, শৈলর স্থানে উমারাণীকে মেনে নিলেও সতীশ তার প্রতি তেমন কোনো দাদাসুলভ আচরণ করেনি। উমারাণীর প্রতি সুরেনের ঔদ্যাসীন্যের কারণে সে উমারাণীর প্রতি যত্নশীল হলেও তার সংসার নতুন করে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' গল্পে পরস্পরের প্রটি কর্তব্যের বিচারে দিদি শশিকলার ভূমিকা যতখানি সক্রিয়, বয়সের কারণে ভাই নীলমণির ভূমিকা ততখানি সক্রিয় নয়। 'উমারাণী' গল্পে উমারাণী কর্তব্যের বিচারে শশিকলারে মতই সক্রিয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো তারও অধিক। আর তার সক্রিয়তার উজ্জ্বলতায় সতীশের কর্তব্য কিছুটা নিষ্প্রভই মনে হয়।

গল্পের শুরুতে প্রকৃতির উপমার সঙ্গে শৈলর মৃত্যু এবং গল্পের শেষে এসে একইভাবে উমারাণীর মৃত্যুর কাঠামো তৈরী করে লেখক বোহেমিয়ান সতীশের এক জীবন বৃত্ত উপস্থাপন করেছে—

'এখনও শীতের অবসানে যখন আবার বাতাবী লেবুর ফুল ফোটে, সজনে-তলায় ফুল কুড়োবার ধুম পড়ে যায়, পাড়াগাঁয়ের বন-ঝোঁপ ঘেঁটু ফুলে আলো করে রাখে, পুকুরের জলে কাঞ্চন ফুলের রাঙাছায়া পড়ে, ফাগুনের দুপুরে আবেশ-বিভোর রোদ আকাশে-বাতাসে থর থর করে কাঁপতে থাকে, তখন আপন মনে ভাবতে ভাবতে কার কথা মনে পড়ে যায়...মনে হয় কে যেন অনেক দূর থেকে এলোমেলো-চুলে ঘেরা কাতর মুখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে...তখন মন বড় কেমন করে ওঠে, হঠাৎ যেন চোখে জল এসে পড়ে'[৭]।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৭১, পৃ ৮।

২. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০-২০০১, পৃ ৬০১।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), শুভম কলকাতা, ১ জানুয়ারি ২০১১, পৃ ৩৭২।

৪. তদেব, পৃ ৩৮৫।

৫. তদেব, পৃ ৩৮০।

৬. তদেব, পৃ ৩৮১।

৭. তদেব, পৃ ৩৮৮।